بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ জানুয়ারি, ২০২৫ মোতাবেক ১৭ সুলাহ্, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ যেসব সারিয়্যা বা সেনাভিযানের উল্লেখ করা হবে সেগুলোর একটি হলো **আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার সেনাভিযান** যা উসায়ের বিন রিযামের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল; এর উল্লেখ প্রথমে করা হবে। আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার এই সেনাভিযান ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল (মাসে) উসায়ের অথবা উসায়ের বিন রিযাম-এর সাথে খায়বারে সংঘটিত হয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যখন আবু রা'ফে সালাম বিন আবিল হুকায়েককে হত্যা করা হয়েছিল তখন ইহুদীরা উসায়ের বিন রিযামকে নিজেদের আমীর মনোনীত করে। সে ইহুদীদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে বক্তব্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.) যখনই ইহুদীদের মধ্য হতে কারো বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছেন অথবা নিজ সাথিদের মধ্য থেকে কাউকে প্রেরণ করেছেন, তখন যে কাজের সংকল্পই করেছেন– তাতে সফল হয়েছেন। কিন্তু আমি সেই কাজ করব যা আমার সাথিদের মধ্য হতে কেউই করে নি। ইহুদীরা জিজ্ঞেস করে, তুমি কী করতে চাও? উসায়ের বিন রিযাম বলে, আমি গাতাফান গোত্রের কাছে যাচ্ছি এবং তাদেরকে জড়ো করছি, আর আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর উদ্দেশ্যে গিয়ে তার বাড়িতে প্রবেশ করব। যখনই কেউ তার শত্রুর বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ করে তখন সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে কিছুটা হলেও সফল হয়েই থাকে। ইহুদীরা বলে, তোমার চিন্তা–ভাবনা খুবই উত্তম। এরপর সে গাতাফান এবং অন্যান্য গোত্রের কাছে যায় এবং তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সমবেত করতে আরম্ভ করে। এই সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি (সা.) এর স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে তিনজন সঙ্গীসহ রমযান মাসে গোপনীয়তার সাথে প্রেরণ করেন।

এর বিশদ বিবরণে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, মহানবী (সা.) যখন এই অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনি দ্রুত তাঁর একজন আনসারী সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে অন্য তিনজন সাহাবীসহ খায়বার অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন, সংগোপনে যাবে এবং সার্বিক পরিস্থিতি অবগত হয়ে দ্রুত ফিরে আসবে। অতএব, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) এবং তার সঙ্গীরা যান এবং চুপিসারে সার্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি অবগত হয়ে এবং এ সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ফিরে আসেন। বরং আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) এবং তার সঙ্গীরা এমন সর্তকার সাথে কাজ করেন যে, খায়বারের দুর্গগুলোর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে এবং উসায়ের বিন রিযামের বৈঠকস্থলের কাছে গিয়ে স্বয়ং উসায়ের ও তার সঙ্গীদের মুখ থেকে একথা শোনেন যে, তারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অমুক অমুক ষড়যন্ত্র করছে। ঐ দিনগুলোতে একজন অমুসলমান ব্যক্তি খারেজা বিন হুসায়েল ঘটনাক্রমে খায়বার থেকে মদীনায় আসে আর সে-ও আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র সত্যায়ন করে এবং বলে, আমি উসায়েরকে এই অবস্থায় দেখে এসেছি যে, সে মদীনায় আক্রমণ করার জন্য তার সৈন্যবাহিনী একত্রিত করছে। এই সত্যায়নের পর

মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র নেতৃত্বে ত্রিশজন সাহাবীর একটি দল খায়বার অভিমুখে প্রেরণ করেন। যদিও রেওয়ায়েত থেকে এটি জানা যায় না যে, মহানবী (সা.) সেই দলকে কী কী নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন, কিন্তু সেই আলোচনা থেকে যা খায়বারে আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) এবং উসায়ের বিন রিযামের মাঝে হয়েছিল তা থেকে অনুধাবন যায় যে, মহানবী (সা.)-এর অভিপ্রায় ছিল, উসায়েরকে মদীনায় ডেকে এনে তার সাথে এমন কোনো সমঝোতা (চুক্তি) করা যেন এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটে এবং দেশে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই বাসনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি (সা.) উসায়েরকে যদি খায়বার অঞ্চলের নেতা হিসেবেও মেনে নিতে হয় তবে এই শর্তে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, ভবিষ্যতে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র দলটি খায়বারে পৌঁছার পর তারা সর্বপ্রথম উসায়ের বিন রিযামের কাছ থেকে আলোচনা চলাকালীন শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নেয় যা থেকে বোঝা যায়, সে সময় (বিপদের) আশঙ্কা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, মুসলমানরা মনে করত (পাছে) কোথাও এই সংলাপের মাঝেই না আবার উসায়েরের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। উসায়ের অঙ্গীকার করে যে, এমনটি হবে না। কিন্তু একই সাথে নিজের মানসম্মান বজায় রাখতে সে আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র নিকট থেকেও একই ধরনের অঙ্গীকার নেয় যে, তিনিও কোনো ক্ষতি করবেন না। তবে এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র পক্ষ থেকে প্রথমে পদক্ষেপ গ্রহণ করা স্পষ্ট করে, সত্যিকার বিপদের আশঙ্কা কার পক্ষ থেকে ছিল। যাহোক, এই কথা ও অঙ্গীকারের পর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) উসায়েরের সাথে আলোচনা শুরু করেন যার সারকথা এটি ছিল, মহানবী (সা.) তোমাদের সাথে একটি শান্তিচুক্তি করতে চান, যেন এই পারস্পরিক যুদ্ধের অবসান ঘটে আর এর জন্য সর্বোত্তম পন্থা হলো, তুমি স্বয়ং মদীনায় গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে সামনাসামনি কথা বলো। যদি এই ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহলে আমি আশা রাখি, মহানবী (সা.) তোমাদের সাথে অনুগ্রহসুলভ ব্যবহার করবেন আর হতে পারে, তোমাকে রীতিমত খায়বারের শাসক বা নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া হবে। উসায়ের, যে ক্ষমতালোভী ছিল, অথবা হতে পারে তার হৃদয়ে অন্য কোনো প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়ও ছিল– (সে) এই প্রস্তাব পছন্দ করে বা নিদেনপক্ষে প্রকাশ করে যে, আমার এই প্রস্তাব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু একইসাথে সে খায়বারের ইহুদী নেতাদের সমবেত করে তাদের কাছেও পরামর্শ চায় যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব এসেছে; এখন এ বিষয়ে কী করা যায়? ইহুদীরা, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতায় অন্ধ ছিল, মোটের ওপর তারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আর তারা উসায়েরকে তার এই অভিপ্রায় থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে বলে, মুহাম্মদ (সা.) তোমাকে খায়বারের আমীর হিসেবে স্বীকার করে নেবে বলে আমাদের মনে হয় না। কিন্তু উসায়ের, যে সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বেশি অবহিত ছিল, সে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং বলে, তোমরা জানো না; মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধ করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছেন। তাই তিনি মনেপ্রাণে চান, যে–কোনো উপায়ে এই যুদ্ধের অবসান ঘটুক।

মোটকথা, উসায়ের বিন রিযাম আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র দলের সাথে মদীনায় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় আর আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র মতো সে-ও নিজের সাথে করে ত্রিশজন ইহুদীকে নিয়ে নেয়। এই দুই দল যখন খায়বার থেকে যাত্রা করে খায়বার থেকে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত **কারকারা** নামক স্থানে পৌঁছে তখন উসায়েরের সংকল্প বদলে যায়, অথবা তার উদ্দেশ্য যদি আগে থেকেই মন্দ হয়ে থাকে তাহলে এটি ধরে নিতে হবে

যে, তখন তা প্রকাশের সময় এসে যায়। যেমন, সে কথা বলতে বলতে অনেক ধূর্ততার সাথে মুসলমানদের দলের একজন সম্মানিত ব্যক্তি **আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস আনসারী** (রা.)-র তরবারির দিকে হাত বাড়ায়। আব্দুল্লাহ্ তখনই বুঝে যান যে, এই দুর্ভাগার নিয়্যত বদলে গেছে! কাজেই তিনি দ্রুত তার উটকে হাঁকিয়ে সামনে এগিয়ে যান এবং পেছনে ফিরে উসায়েরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, **'হে আল্লাহ্র শত্রু! তুমি কি আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাও?'** আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.) দুইবার এই বাক্য পুনারাবৃত্তি করেন কিন্তু উসায়ের (এর) কোনো উত্তর দেয় নি কিংবা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টাও করে নি, উপরন্তু সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। এটি সম্ভবত ইহুদীদের মধ্যে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ইঙ্গিত ছিল যে, এমন (মোক্ষম) সুযোগ এলে সবাই মিলে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতএব, সেখানে পথিমধ্যেই মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে তরবারির ঝংকার শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ যুদ্ধ বেধে যায়। আর যেহেতু উভয় দলই সংখ্যায় সমান ছিল এবং ইহুদীরা আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল আর মুসলমানরা একেবারেই অপ্রস্তুত ছিল অর্থাৎ তাদের মধ্যে যুদ্ধের কোনো অভিপ্রায় ছিল না, তথাপি আল্লাহ্ তা'লার এমন অনুগ্রহ হয় যে, কোনো কোনো মুসলমান আহত হলেও তাদের মধ্যে কারো প্রাণহানী হয় নি। কিন্তু অপরদিকে সকল ইহুদী নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার স্বাদ আস্বাদন করে মাটিতে মিশে যায়।

যখন সাহাবীদের এই দলটি মদীনায় ফেরত আসে এবং মহানবী (সা.) অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি (সা.) মুসলমানদের নিরাপত্তা ও তাদের বেঁচে যাবার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, قَدْ نَجَّاكُمُ اللّٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ (আল্লাহ্র) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো! কেননা আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এই অত্যাচারী দলের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এ ঘটনা সম্পর্কে কতক খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক এই আপত্তি করেছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার দল পথিমধ্যে সুযোগ মতো হত্যা করার উদ্দেশ্যে উসায়ের ও তার সাথিদেরকে খায়বার থেকে বের করে এনেছিল। আপত্তিটি পশ্চিমা গোঁয়ার্তুমির এক অপছন্দনীয় বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামের ওপর আপত্তিকারীরা মুখে যা আসে তা-ই বলে থাকে। কেননা যেমনটি ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে, ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, মুসলমানরা এ উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। বরং লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ বাদ দিলেও কেবল আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.)-র এই বাক্য– 'হে আল্লাহ্র শত্রু! তুমি কি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাচ্ছো?' আর সেইসাথে মহানবী (সা.)-এর উক্তি– 'কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো! কেননা আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এই অত্যাচারী দলের হাত থেকে রক্ষা করেছেন'– একথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, মুসলমানদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও শান্তিপূর্ণ ছিল আর যা কিছু ঘটেছে তা কেবলমাত্র সেই বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল ছিল যা ইহুদীরা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী মুসলমানদের সাথে করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটিকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে বর্তিয়েছেন। যাহোক, এই অভিযানের ফলাফল এটিই হয়েছিল।

এরপর রয়েছে আমর বিন উমাইয়্যা যামরীর অভিযান, যা আবু সুফিয়ানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। ইবনে হিশাম, ইবনে কাসীর, তাবারী প্রমুখ এই অভিযানকে চতুর্থ হিজরী সনের অধীনে রাজী-র ঘটনার পর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে সা'দ এই অভিযানকে ৬ষ্ঠ হিজরী সনের অভিযানসমূহের অধীনে উল্লেখ করেছেন। যুরকানীও ইবনে সা'দের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়ে ৬ষ্ঠ হিজরী সনের অধীনে এই অভিযানের উল্লেখ করেছেন। হযরত

মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে এই অভিযানকে ৬ষ্ঠ হিজরী সনের বলে উল্লেখ করেছেন এবং বিস্তারিত বিবরণে লিখেছেন:

এই অভিযানের সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে হিশাম এবং তাবারী এটিকে ৪র্থ হিজরী সনের বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইবনে সা'দ এটিকে ৬ষ্ঠ হিজরী সনের বলে উল্লেখ করেছেন। আর আল্লামা কাস্তালানী এবং যুরকানী ইবনে সা'দের বর্ণনাকেই প্রধান্য দিয়েছেন। তিনি লেখেন, আমিও এটিকে ৬ষ্ঠ হিজরী সনের উল্লেখ করেছি, বাকি আল্লাহ্ তা'লা সবচেয়ে ভালো জানেন। ইবনে সা'দের বর্ণনার মূল বিষয়বস্তুর সমর্থন বায়হাকীও করেছেন, কিন্তু তাতে এই ঘটনার সময়কাল সম্পর্কে জানা যায় না।

এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ হলো, আবু সুফিয়ান কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তিকে বলে, তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ নেই যে মুহাম্মদ (সা.)-কে বাজারে ঘোরাফেরা করার সময় অতর্কিতে হত্যা করবে? অতএব আবু সুফিয়ানের নিকট বেদুইনদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার বাড়িতে আসে এবং বলে, তুমি আমাকে লোকজনের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকারী পাবে। আমি যখন কাউকে পাকড়াও করি শক্তিশালী হাতে পাকড়াও করি এবং আমি সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারি। তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো তাহলে আমি তাদের কাছে যাব এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করব। আর আমার কাছে একটি ছুরি আছে যা শুকুনের পালকের ন্যায়। সেটি দিয়ে আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করব আর এরপর আমি কোনো কাফেলায় আত্মগোপন করব আর পালিয়ে সেখান থেকে চলে আসব, কেননা আমি রাস্তাঘাট সম্পর্কে খুবই অভিজ্ঞ। আবু সুফিয়ান বলে, তুমিই এই কাজের উপযুক্ত লোক! অতঃপর আবু সুফিয়ান তাকে উট এবং পাথেয় প্রদান করে এবং বলে, নিজের উদ্দেশ্যকে গোপন রাখবে। সেই ব্যক্তি রাতে বের হয় এবং নিজের বাহনে করে পাঁচ দিন সফর অব্যহত রাখে আর ৬ষ্ঠ দিন সকালে সে হার্‌রা নামক স্থানে পৌঁছে। কালো পাথুরে ভূমিকে হার্‌রা বলা হয় আর মদীনা দুইটি হার্‌রার মাঝে অবস্থিত; একটি পূর্ব দিকের হার্‌রা আর অপরটি পশ্চিম দিকের হার্‌রা। যাহোক, এরপর সে মদীনায় পৌঁছে মানুষের কাছে মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকে। তাকে তাঁর (সা.) সম্পর্কে অবহিত করলে পরে সে নিজের বাহনটিকে বেঁধে মহানবী (সা.)-এর কাছে যায়। তিনি (সা.) তখন বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের মসজিদে অবস্থান করছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে দেখতেই বলেন, নিশ্চয় এই ব্যক্তির ধোঁকা দেওয়ার অভিপ্রায় রয়েছে, [অর্থাৎ তিনি (সা.) তার গতিবিধি দেখেই বুঝে ফেলেন;] আর আল্লাহ্ তা'লা তার ও তার অভিসন্ধির মাঝে প্রতিবন্ধক হবেন। সুতরাং সে মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে গেলে হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) তাকে তার চাদরের ভেতরের প্রান্ত ধরে টান দেন আর সহসা তার হাত থেকে ছুরিটি পড়ে যায় ও সে চিৎকার করতে থাকে যে, আমার রক্ত, আমার রক্ত! অর্থাৎ, আমাকে প্রাণভিক্ষা দাও! সে ধরা পড়ে যায়। হযরত উসায়েদ (রা.) তার ঘাড় ধরেন, এরপর তাকে ছেড়ে দেন। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, আমাকে সত্যি করে বলো, তুমি কে? সে বলে, আমি প্রাণভিক্ষা চাই। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তখন সে তার (মদীনায় আসার) উদ্দেশ্য ও আবু সুফিয়ান তার জন্য যা কিছু নির্ধারণ করেছিল সে সম্পর্কে বলে দেয়। অতঃপর মহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে দেন আর এই অনুগ্রহের পরিণতিতে সে মুসলমান হয়ে যায় এবং বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি মানুষের ভয় করতাম না, কিন্তু যখন আমি আপনাকে (সা.) দেখি তখন আমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় আর (আমার) হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর আমি আমার সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাবলাম

যা করার আমার দৃঢ় সংকল্প ছিল, যার জন্য অনেক আরোহী চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কেউ সফল হয় নি। আমি বুঝতে পারি যে, আপনার নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে এবং নিশ্চয় আপনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা আপনার সুরক্ষা করছেন আর আবু সুফিয়ানের সেনাদল শয়তানের সেনাদল। একথা শুনে মহানবী (সা.) মৃদু হাসেন। এরপর সেই ব্যক্তি কিছুদিন (মদীনায়) অবস্থানের পর মহানবী (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে চলে যায়। এরপর সেই ব্যক্তির আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় নি। পরবর্তীতে ইতিহাসেও তার সম্পর্কে আর কোনো উল্লখ পাওয়া যায় নি।

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমর বিন উমাইয়্যা ও সালামা বিন আসলাম (রা.)-কে আবু সুফিয়ান বিন হারব-এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং বলেন, তোমরা দুইজন তাকে অসতর্ক অবস্থায় পেলে তাকে হত্যা করবে। [সে যেহেতু এমন ষড়যন্ত্র করেই যাচ্ছে তাই ঠিক আছে; তার প্রতিকার এটিই যে, তাকে নির্মূল করা হোক, যেন এই ঝগড়া-বিবাদ শেষ হয়।] ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) আমর বিন উমাইয়্যা (রা.)-র সাথে জাব্বার বিন সাখ্‌র আনসারীকে প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং তারা উভয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে মক্কার কাছে পৌঁছে যান আর তারা উভয়েই তাদের উট দুটোকে ইয়াজেজের উপত্যকাগুলোর মধ্য থেকে একটি উপত্যকায় লুকিয়ে রাখেন, যা মক্কা থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তারা রাতের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করেন। হযরত জাব্বার বা সালামা (রা.) আমর (রা.)-কে বলেন, আমরা যদি বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করতে পারতাম তাহলে কত ভালো হতো; দুই রাকআত নামায আদায় করতে পারতাম! হযরত আমর (রা.) বলেন, (মক্কার) লোকেরা রাতের খাবার শেষে তাদের উঠানে আসর বসায়। তারা আমাকে দেখামাত্রই চিনে ফেলবে। আমি মক্কায় সাদা-কালো ঘোড়ার থেকেও বেশি পরিচিত। অর্থাৎ অনেকেই আমাকে চেনে, আমার পরিচয় জানে। আমরের সঙ্গী বলেন, মোটেই না। ইনশাআল্লাহ্, আমরা (তওয়াফ করতে) যাব। আমর বর্ণনা করেন, সে আমার কথা মানতে অস্বীকার করে। এরপর আমরা বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করি এবং নামায আদায় করি। অর্থাৎ তারা সেখানে চলে যান। এরপর (তিনি) বলেন, আমরা আবু সুফিয়ানের উদ্দেশ্যে বের হই; অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে এসেছিলাম (তা) পূরণ করার জন্য (বের হই)। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মক্কায় হাঁটছিলাম। হঠাৎ মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাকে দেখে চিনে ফেলে। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, সে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান ছিল যে চিনতে পেরেছিল। মুয়াবিয়া বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমর বিন উমাইয়্যা নিশ্চয়ই কোনো মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে (মক্কায়) এসেছে। সে কুরাইশদের বলে দেয়; তাদের আমরের বিষয়ে আশঙ্কা হয় আর তারা খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়ে। আমর বলেন, আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, দ্রুত পালাও। আমরা বেরিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করলাম আর আমরা একটি পাহাড়ে আরোহণ করলাম। তারা আমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল, তবে আমরা পাহাড়ে উঠে পড়েছিলাম। তারা আমাদের খুঁজে পায় নি আর আমরা পাহাড়ের একটি গুহায় প্রবেশ করলাম। আমরা সেখানে রাত্রি যাপন করলাম এবং আমরা পাথর নিলাম আর নিজেদের চতুর্পাশে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে রাখলাম। যখন ভোর হলো তখন কুরাইশের এক ব্যক্তি আমাদের নিকটবর্তী হলো। সেখানে কুরাইশের এক ব্যক্তিকে ঘুরাফেরা করতে দেখলাম। ইবনে সা'দের মতে সেটি উবায়দুল্লাহ্ বিন মালেক বিন উবায়দুল্লাহ্ তৈয়মি ছিল। কিন্তু ইবনে ইসহাকের মতে সে উসমান বিন মালেক আব্দুল্লাহ্ ছিল। সে নিজের ঘোড়াকে হাঁকিয়ে নিচ্ছিল। সে গুহার কাছে ছিল আর আমরা গুহার ভেতরে। আমি বললাম, যদি সে আমাদের দেখে ফেলে তাহলে সে চিৎকার করবে এবং আমরা ধরা

পড়ে যাব আর মারা পড়ব। অর্থাৎ সে কাফিরদেরকে ডাকবে। আমার কাছে ছুরি ছিল যা আমি আবু সুফিয়ানের জন্য প্রস্তুত করেছিলাম। আমি বেরিয়ে তার বুকে আঘাত করলাম; এতে সে চিৎকার করে উঠল আর কুরাইশরা তার ডাক শুনতে পেল। আমি ফেরত আসলাম এবং গুহাতে প্রবেশ করলাম। লোকেরা তার কাছে ছুটে আসলো, সে সময় সে জীবন–মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিল। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কে মেরেছে? সে উত্তর দিল, আমর বিন উমাইয়্যা। এরপর সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল এবং সেখানেই মারা গেল। কিন্তু সে আমাদের অবস্থান জানাতে পারল না। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, যখন তারা তার কাছে আসল তখন মক্কাবাসীদেরকে আমাদের অবস্থান জানানোর মতো শক্তি তার মাঝে অবশিষ্ট ছিল না। আমর বিন উমাইয়্যা বর্ণনা করেন, আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, তুমি নিজ প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যাও। তুমি নিজের উটের কাছে যাও এবং এতে আরোহণ করে চলে যাও। সে চলে গেল। আমর বিন উমাইয়্যা বলেন, অতঃপর আমি রওনা দিলাম আর **যাজনান** পৌঁছে গেলাম। **যাজনান** মক্কা থেকে এক **বুরিদ** অর্থাৎ বারো মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি পাহাড়। এরপর আমি একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম এবং গুহায় প্রবেশ করলাম। এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে **আরয** পৌঁছে গেলাম। **আরয** মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম যেখানে কাফেলা বিশ্রাম নিত। এরপর আমি বাহনে আরোহণ করে **নাকী** পৌঁছালাম। নাকী মদীনা থেকে দুই রাতের দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। এই দূরত্ব সীরাত ইবনে হিশামে লেখা আছে। সে সময় কুরাইশের দুই মুশরিককে দেখতে পেলাম তারা মদীনার দিকে আসছিল; তাদেরকে কুরাইশ গোয়েন্দা বানিয়ে পাঠিয়েছিল যেন অবস্থা ও ঘটনাবলি সম্পর্কে তদন্ত করে। আমি তাদের উভয়কে বললাম, তোমরা আত্মসম্র্পণ করো; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। আমি তাদের একজনকে তির নিক্ষেপ করে হত্যা করলাম এবং অন্যজন আমার কাছে আত্মসমর্পণ করল। আমি তাকে বেঁধে মদীনায় নিয়ে আসলাম। [স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে নি বরং তাদের উভয়ের মাঝে যুদ্ধ হয়েছে সেখানে, পরস্পর তির বিনিময় হয়েছে।] যাহোক, আমর বিন উমাইয়্যা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নিজের অবস্থা ও পরিস্থিতি বলছিলেন আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃদু হাসছিলেন। এরপর তিনি (সা.) আমর বিন উমাইয়্যার মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন।

এই সারিয়্যার বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়াত রয়েছে। ইবনে হিশাম, ইবনে কাসীর ও তাবারী প্রমুখ এই অভিযান চতুর্থ হিজরী সনে পরিচালিত হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন; এতে হযরত খুবায়েব বিন আদী (রা.)-র লাশকে কাষ্ঠদণ্ড থেকে নামানোর উল্লেখ করেছেন। হযরত খুবায়েব (রা.) রাজী'র যুদ্ধে বন্দি হয়ে মক্কায় বিক্রি হন। কুরাইশরা তাকে কাঠের সাথে বেঁধে শহীদ করেছিল। কিন্তু ইবনে সা'দ আমর বিন উমাইয়্যার অভিযানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কাঠ থেকে লাশ নামানোর উল্লেখ করেন নি। ইবনে সা'দের রেওয়ায়েত এক্ষেত্রে অধিক সঠিক মনে হয়। কেননা হযরত খুবায়েবের (রা.) লাশ নামানোর জন্য পৃথক একটি দলের যাবার উল্লেখ পুস্তকসমূহে পৃথক স্থানে বিদ্যমান।

যুরকানীও একই মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং আমর বিন উমাইয়্যার অভিযান শেষে তিনি লিখেছেন, খুবায়েব বিন আদীর লাশ নামানোর জন্য মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের এবং মিকদাদ (রা.)-কে প্রেরণ করেছিলেন।

এই বিষয়ে সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও (রা.) লিখেছেন, আমর বিন উমাইয়্যার এই অভিযানের বৃত্তান্তে তিনি খুবায়েব বিন আদীর

লাশ কাষ্ঠদণ্ড থেকে নামানোর ঘটনা উল্লেখ করেন নি। তিনি যা লিখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ হলো:

আহযাবের যুদ্ধের পরাজয়ের স্মৃতি মক্কার কুরাইশদের মনেপ্রাণে আগুন লাগিয়ে রেখেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই অন্তর্জ্বালা আবু সুফিয়ানকে বেশি পীড়া দিচ্ছিল যে মক্কার নেতা ছিল আর আহযাবের যুদ্ধে বিশেষভাবে লাঞ্ছনাকর পরাজয় বরণ করেছিল। কিছু সময় পর্যন্ত আবু সুফিয়ান ভিতরে ভিতরে জ্বলছিল, কিন্তু পরিশেষে বিষয়টি তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় আর সেই অগ্নির অদৃশ্য শিখা প্রকাশ্য রূপ লাভ করছিল। স্বাভাবিকভাবেই কাফিরদের মূল শত্রুতা, বরং বলা যায় প্রকৃত শত্রুতা ছিল মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার প্রতি। এ কারণে তখন আবু সুফিয়ান এই চিন্তা করছিল, বাহ্যিক চেষ্টাপ্রচেষ্টা ও কৌশলে যেহেতু ফল হলো না, তাই এখন কোনো গোপন ষড়ুযন্ত্রের মাধমে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করে দেওয়া যাক। সে জানত, মহানবী (সা.)-এর আশেপাশে বিশেষ কোনো পাহারার ব্যবস্থা থাকে না, বরং কখনো কখনো তিনি একদম অরক্ষিত অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে আসা–যাওয়া করেন, শহরের অলিগলিতে ঘোরাফেরা করেন। মসজিদে প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচ বেলার নামায পড়তে আসেন। আর সফরেও সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিমতামুক্ত ও স্বাধীনভাবে থাকেন। একজন ভাড়াটে খুনির জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে? এ চিন্তা মাথায় আসতেই আবু সুফিয়ান মনে মনে মহানবী (সা.)-কে হত্যার পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করে।

সে যখন এ বিষয়ে পুরো সংকল্পবদ্ধ হয় তখন সে একদিন সুযোগ বুঝে নিজের অনুসারী কিছু কুরাইশ যুবককে বলে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোনো যুবক নেই যে মদীনা গিয়ে গোপনে মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবলীলা সাঙ্গ করবে? তোমরা জানো, মুহাম্মদ (সা.) প্রকাশ্যে মদীনার অলিগলিতে ঘুরে বেড়ায়। সেসব যুবক এ কথা শুনতেই তা লুফে নেয়। তাদের বিষয়টি পছন্দ হয়। এরপর বেশি দিন পার হয় নি, এর মাঝে এক বেদুঈন যুবক আবু সুফিয়ানের কাছে আসে আর বলে, আমি আপনার প্রস্তাব শুনেছি এবং আমি এ কাজ করার জন্য তৈরি আছি। [পূর্বে যেভাবে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সে ঘটনাকে মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও বর্ণনা করেছেন।] সে আরো বলে, আমি এমন এক অতি সাহসী ও শক্তিশালী মানুষ যার হাত থেকে কেউ ছুটতে পারে না আর যার আক্রমণ হয়ে থাকে আকস্মিক। আপনি যদি আমাকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করে সাহায্য করেন, তাহলে আমি মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা করার উদ্দেশ্যে যেতে তৈরি আছি। আমার কাছে এমন একটি খঞ্জর রয়েছে যা শিকারী শকুনের গোপন ডানার মতো (লুক্কায়িত) থাকবে। অতএব আমি মুহাম্মদের (সা.) ওপর আক্রমণ করব, এরপর পালিয়ে কোনো কাফেলার সাথে মিশে যাব আর মুসলমানরা আমাকে ধরতে পারবে না। [পূর্বে যে ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল, সেই ঘটনাই তিনি (রা.) বর্ণনা করছেন।] এরপর বললো, আমি মদীনার পথঘাট সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখি। আবু সুফিয়ান বললো, খুবই ভালো কথা; আমরা তোমাকেই খুঁজছি। এরপর আবু সুফিয়ান তাকে দ্রুতগামী উট ও পথের খরচ ইত্যাদি প্রদান করে বিদায় দেয় এবং নির্দেশ দিয়ে বলে, এই কথা কাউকে বোলো না।

মক্কা থেকে বেরিয়ে এ ব্যক্তি দিনের বেলায় লুকিয়ে এবং রাতে সফর করে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে; ৬ষ্ঠ দিন মদীনায় পৌঁছে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর খোঁজ করতে করতে সোজা বনু আব্দুল আশহাল-এর মসজিদে পৌঁছে। তিনি (সা.) তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন। সে দিনগুলোতে নতুন নতুন মানুষ মদীনায় আসত, যে কারণে কোনো মুসলমান তাকে দেখে সন্দেহ করে নি। কিন্তু মহানবী (সা.) যখনই তাকে নিজের দিকে

আসতে দেখেন, [তিনি (সা.) তখন মসজিদেই ছিলেন;] তিনি (সা.) বলেন, এ ব্যক্তি কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। সে ব্যক্তি একথা শুনে আরো দ্রুত তাঁর (সা.) দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু একজন আনসারী নেতা উসায়েদ বিন হুযায়ের দ্রুত লাফ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন আর এই ধস্তাধস্তির মাঝে তার হাত সে ব্যক্তির লুকানো খঞ্জরের ওপর পড়ে যার ফলে সে ঘাবড়ে গিয়ে বলে, আমার রক্ত! আমার রক্ত! [এখানে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। কেবল চাদরই টান দেন নি, বরং রীতিমতো তাকে ধরে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন, যার ফলে তার হাত থেকে খঞ্জর বেরিয়ে যায়।] যাহোক, তারপর সে সশব্দে বলে ওঠে, আমাকে ক্ষমা করো। যখন তাকে কাবু করে ফেলা হয় তখন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, সত্য সত্য বলো! তুমি কে এবং কী উদ্দেশ্যে এসেছ? সে বলে, আমার জীবন ভিক্ষা দিলে আমি সব বলে দেবো। অতঃপর সে পূর্ববর্ণিত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, ঠিক আছে, তোমাকে ক্ষমা করা হবে। সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে, আবু সুফিয়ান তাকে এত এত পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এরপর এ ব্যক্তি কয়েক দিন মদীনায় অবস্থান করে এবং সানন্দে মুসলমান হয়ে মহানবী (সা.)-এর মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আবু সুফিয়ানের এই হত্যার ষড়যন্ত্রের কারণে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সতর্ক থাকাটা পূর্বের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি (সা.) তাঁর দুইজন সাহাবী আমর বিন উমাইয়্যা যামরী এবং সালামা বিন আসলাম-কে মক্কাভিমুখে প্রেরণ করেন। আর আবু সুফিয়ানের এই হত্যার ষড়যন্ত্র ও তার পূর্ববর্তী রক্তক্ষয়ী কার্যকলাপ দৃষ্টিতে রেখে তাদেরকে অনুমতি দেন, সুযোগ পেলে অবশ্যই ইসলামের এই যুদ্ধংদেহি শত্রুকে বিনাশ করে দেবে। কিন্তু উমাইয়্যা এবং তার সাথি মক্কায় পৌঁছালে কুরাইশ সতর্ক হয়ে যায়। আর এই দুইজন সাহাবী প্রাণ বাঁচিয়ে মদীনায় ফেরত আসেন। পথিমধ্যে তারা কুরাইশের দুইজন গোয়েন্দাকে পান যাদেরকে কুরাইশ নেতারা মুসলমানদের গতিবিধি এবং মহানবী (সা.)-এর অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করেছিল। আর এটি মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এই ষড়যন্ত্রও হয়ত কুরাইশের আরেকটি রক্তক্ষয়ী চক্রান্তের ছক হয়ে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় উমাইয়্যা এবং সালামা তাদের গোয়েন্দাগিরির কথা আঁচ করে সেই গোয়েন্দাদের ওপর আক্রমণ করে তাদের বন্দি করতে যান, কিন্তু তারা পাল্টা আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে একজন গোয়েন্দা তো মারা যায় এবং অপরজনকে তারা বন্দি করে মদীনায় নিয়ে আসেন।

অবশিষ্টাংশ আগামীতে বর্ণনা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পাকিস্তানে বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য আমি দোয়ার আহ্বান করে থাকি। এর ভয়াবহতা অনেক সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। প্রশাসন এবং সরকারও মনে হয় উগ্রপন্থি মোল্লাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। প্রথমে মসজিদের মিনার ভাঙা, মেহরাব গুঁড়িয়ে দেবার সংবাদ আসতো; এগুলো নিয়ে তাদের আপত্তি ছিল। কিন্তু গতকাল ডাস্কায় তারা রাস্তা বানানোর অজুহাতে প্রথমে নোটিশ পাঠায় যে, আমরা এতটুকু জায়গা নিয়ে নেব এবং সেখানে বুলডোজার চালিয়ে জায়গা খালি করব। এতে মসজিদের সামান্য কিছু অংশ, গোসলখানা ইত্যাদি পড়ার কথা। কিন্তু যখন বুলডোজার নিয়ে আসে তখন তারা মোল্লাদের কথায় গোটা মসজিদ ভেঙে ফেলে ও সেটিকে শহীদ করে দেয়। এই মসজিদটি অনেক পুরানো স্থাপনা; দেশভাগের পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। সম্ভবত হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। যাহোক, এরা বর্তমানে এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে

শীঘ্রই পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন এবং তাদের ষড়যন্ত্র তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর করুন। সেজন্য আহমদীদের, বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদের অনেক দোয়া করা প্রয়োজন, এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

একইভাবে ফিলিস্তিন ইস্যুতে যে শান্তিচুক্তি হতে যাচ্ছে– কেউ কেউ বলে হয়ে গেছে, কখনো বলে হয় নি; শান্তিচুক্তির পরও বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। এ বিষয়ে কিছু লোক অযথাই আনন্দ প্রকাশ করছে। কিন্তু তাদের বোঝা উচিত, দাজ্জালী শক্তির কোনো বিশ্বাস নেই। তারা বলে এক আর করে আরেক। তাই এতটা সুধারণা পোষণ করার দরকার নেই। তাদের জন্য দোয়া করাও আবশ্যক এবং মুসলমানদের বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টাও করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম জাতিকেও সেই বোধবুদ্ধি দান করুন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং পরে তাদের গায়েবানা জানাযাও পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ মোকাররম শেখ মুবারক আহমদ সাহেবের। তিনি রাবওয়া সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার নায়েব দিওয়ান ছিলেন। তিনি গত ১১ জানুয়ারি তারিখে সাতাত্তর বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন। মরহুম মূসী ছিলেন, জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার দাদা শেখ মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব ১৯৩৮ সনে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি গুরুদাসপুর জেলার বাটালা তহসিলের নাঙ্গালের অধিবাসী ছিলেন। শেখ মুবারক সাহেব বি.এ বি.এড পাশ করার পর ৬৬ সন থেকে ৮১ সন পর্যন্ত প্রায় পনের বছর তালীমুল ইসলাম হাইস্কুলে সেবা প্রদান করেন। এছাড়াও পরবর্তীতে ১৯৭৩ যখন স্কুল জাতীয়করণ করা হয়, তখন তিনি পুনরায় বিভিন্ন স্কুলে সরকারি চাকুরি করেন; শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন এবং চল্লিশ বছর তিনি জামা'তের সেবা করেন। ১৯৮২ সনে তিনি খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) সমীপে ওয়াকফের আবেদন করেন এবং তার আবেদন মঞ্জুর হয়। অতঃপর ১৯৮২ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) শতবর্ষ জুবিলীতে তাকে নায়েব উকিলরূপে নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি নায়েব উকিলুল মাল হিসাবেও সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি সদর আঞ্জুমানের এডিশনাল নায়েব বাইতুল মাল এবং পরবর্তীতে নায়েব বাইতুল মাল হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। অতঃপর নায়েব দিওয়ান ও নায়েব রিশতানাতা হিসাবে দীর্ঘদিন তিনি জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনেও কাজ করেছেন; আনসারুল্লাহ্র কায়েদ ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিভিন্ন বিভাগে মোহতামিমও ছিলেন।

তার ভাগ্নে ও জামাতা মুরব্বী সিলসিলাহ্ এহসান মাহমুদ সাহেব বলেন, মুরব্বীদেরকে তিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন, খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং আর্থিক বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করবে না। তিনি বলেন, নামায আদায়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। শেষ বয়সেও মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের চেষ্টা করতেন। জামা'তী ও ব্যক্তিগত সভাসমূহে সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তাগিদ দিতেন এবং সর্বদা এই দোয়া করতেন যে, আমার সন্তানদেরকেও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখো। তিনি বলেন, আমি প্রতিটি বিষয় খলীফাতুল মসীহ্কে লিখি, কোনো কিছু গোপন করি না। কোনো ভুল করলে সেটিও লিখি যেন সেটির সংশোধন হয়ে যায় এবং আমি লাভবান হই।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে অতি উত্তমভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যখন সদর আঞ্জুমানে ছিলাম আমিও তাকে দেখেছি, আমার সাথেও তিনি কাজ করেছেন। সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেবার বিষয়ে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

ছিলেন। সাদামাটা জীবন কাটানো, অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং জামাতের কাজে পুরো সময় সময় দেওয়া ছিল তার বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ সময় এমন হতো যে, তিনি সফরে যেতেন আর সফর শেষ করে এসেই দফতরে বসতেন, সন্ধ্যায় পুনরায় সফরে বের হয়ে যেতেন। সর্বদা জামা'তের সেবা করার সুযোগ খুঁজতেন।

তার সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ তাকে বিশ্রাম নেবার পরামর্শ দেন; [তিনি একবার অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন;] উত্তরে তিনি বলেন, আমার মৃত্যুতেই আমার অবসর হবে। দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরাও তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা বলেন, সর্বদা আমাদের খেয়াল রাখতেন। প্রত্যেক বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন আর তা সমাধা করার চেষ্টা করতেন। এমনকি আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনও (পূর্ণ করার চেষ্টা করতেন)।

এমনিভাবে তিনি আরো লেখেন, পড়াশোনার প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। আমি দেখেছি, বাড়িতে সবসময় পড়াশোনায় রত থাকতেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক এবং মলফুযাত ইত্যাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন আর নিজ সন্তানদেরও এ বিষয়ে জোর তাগিদ দিতেন।

জামা'তের আইনকানুন ও নিয়মনীতি সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ছিল আর সিদ্ধান্ত নেবার শক্তিও তার মাঝে ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাকে বিশেষ যোগ্যতা দান করেছিলেন। যখন আঞ্জুমানের বিধিবিধান সংশোধন করা হয়, তিনি সেই কমিটিরও সদস্য ছিলেন। তখন তিনি দূরদর্শিতাপূর্ণ পরামর্শ দিতেন।

করাচির ইন্সপেক্টর বাইতুল মাল সৈয়্যদ দাউদ আহমদ সাহেব লেখেন, ২৩ বছর সময়কাল শেখ সাহেবের অধীনে অর্থ বিভাগে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। খুবই সুন্দরভাবে কাজ আদায় করে নিতেন। যেখানে ভুল হতো সেখানে শুধরে দিতেন আর যেখানে ভালো কাজ হতো সেখানে বাহবা দিতেন। দপ্তরের প্রত্যেক কর্মীদের ধারণা এটিই ছিল যে, শেখ সাহেবের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেক কর্মীর পারিবারিক এবং কর্মস্থলের দুশ্চিন্তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন আর যতদূর সম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে এক স্ত্রী, ছয় ছেলে এবং এক মেয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ কাতার নিবাসী মরহুম মোকাররম মুনির আদিলভী সাহেবের যিনি সম্প্রতি ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন। তার তিন ছেলে এবং এক মেয়ে সকলেই কাতারে বসবাস করেন। মোসাল্লাম দারাভী সাহেব লেখেন, তার মাধ্যমেই আমি এবং আমার ভাই আহমদীয়া জামা'ত গ্রহণ করেছি। তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় মোবাল্লেগ, সুবক্তা, বিচক্ষণ এবং আহমদী তবলীগী সাহিত্যের লেখক। ১৯৮৪ সালের শুরুর দিকে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র সাথে তার সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। তারপর এখানে অর্থাৎ লন্ডনে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন এবং **লিকা মা'আল আরব** এবং আরো কিছু প্রোগ্রামের অনুবাদ করেন। তিনি দশটির অধিক পুস্তক রচনা করেন যার মাঝে ৭টি পুস্তক আহমদীয়া জামা'তের তবলীগের বিষয়বস্তু সম্বলিত ছিল। অনেক দেরিতে এসেছেন কিন্তু জামা'তের জন্য অনেক কাজ করে গিয়েছেন। সিরিয়া জামা'তের সেক্রেটারি তবলীগ এবং সেক্রেটারি তা'লীম ও তরবিয়ত হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ডজন ডজন সদস্য তার মাধ্যমে বয়আত গ্রহণ করেন। আরবের অনেক জনপদে তার মাধ্যমে আহমদীয়াত পৌঁছেছে। এ কারণে একবার আহমদী বিরোধীরা তার গাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেয়। তার ধর্মীয় তর্কবিতর্ক এবং তবলীগী

বৈঠকের কারণে তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয় যার ফলে ১৯৮৯ সালে আরব উপদ্বীপের অন্যান্য কিছু সদস্যদের সাথে তৎকালীন সরকারের আমলে কয়েক মাস কারাবন্দিও ছিলেন। সিরিয়ার পরিস্থিতি যখন খারাপ হতে থাকে তখন তিনি নিজ সন্তানদের সাথে নিয়ে কাতারে হিজরত করেন।

সিরিয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট ওয়াসিম সাহেব লেখেন, অগণিত পুস্তক তিনি রচনা করেন যার দরুন আহমদী লাইব্রেরি সমৃদ্ধ হয়ে যায়। আহমদীয়াতের শিক্ষামালা তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল এবং স্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপন করেন। তার কারণে অসংখ্য মানুষ আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

বাসিল আদিলভী সাহেব লেখেন, মরহুম তার পুরো জীবন আহমদীয়া জামা'তের সেবায় কাটিয়েছেন। খিলাফতের একজন প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (রাবে.)-র জন্য ইংরেজি থেকে আরবী অনুবাদ তিনি করতেন। আহমদীয়াতের একজন নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। আহমদীয়াতের তবলীগ এবং প্রচার ও প্রসারের কাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। আর সিরিয়াতে অবস্থিত অনেক আহমদীর হেদায়াতের কারণ হন। তবলীগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমনও করেছেন। ২০১৩ সালে সিরিয়াতে অন্তঃকলহ বৃদ্ধি পেলে কাতার স্থানান্তরিত হন। সেখানে ফেসবুকে আহমদীয়াত এবং খিলাফত সম্পর্কে লিখতে থাকেন এবং আগ্রহীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি একজন বাগ্মী সুবক্তা ছিলেন। কুরআন ও সুন্নত থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সত্যতার দলিল-প্রমাণাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। তিনি খিলাফতের মাহাত্ম্য এবং সুরক্ষায় ইংরেজি থেকে আরবী ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। তিনি স্বীয় অস্তিত্ব, ভাষা, কলম এবং জীবনকে আহমদীয়াতের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। প্রতিকূলতার মাঝেও তার অবিচলতা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীর সত্যতার ওপর ঈমান আনয়নের কারণে তাকে নিজ আত্মীয়স্বজন এবং দামেস্কের সমাজে অনেক দুঃখকষ্টও সহ্য করতে হয়েছে।

নাযার আযীব সাহেব বলেন, আমি আদিলভী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত হই। শ্রদ্ধেয় খালেদ ইযাম সাহেব তার দাজ্জাল সংক্রান্ত একটি বই কোথাও থেকে সংগ্রহ করেন। আমার সেই বইটি খুব ভালো লাগে। তিনি আমার সব দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেন। এরপর আমি তার বই 'কাতলে মুরতাদ' (ধর্মত্যাগীকে হত্যা) আর এরপর 'জিন্ন' সংক্রান্ত (বই) পাঠ করি। (অতঃপর) তার সাথে ফোনে যোগাযোগ করি। এরপর আমি এবং খালেদ ইযাম সাহেব বয়আত গ্রহণ করি। মরহুম জানার পর ভীষণ আনন্দিত হন।

কাতার জামা'তের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার ইমরান রহমান সাহেব বলেন, তিনি খুবই বিনয়ী মানুষ ছিলেন। জামা'তের নেযামের সাথে সর্বদা সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখতেন। খিলাফতের সাথে তার ভালোবাসা ও আনুগত্য খুবই অসাধারণ ছিল। এখানে এমটিএ-র মাধ্যমে খুতবা শুনতেন এবং আমার অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখতেন। আর এগুলোর কথা বার বার বলতেন। আর্থিক কুরবানীতে অগ্রগামী ছিলেন। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতেন যে, তার চাঁদা যেন সর্বপ্রথম আদায় হয়। তিনি বলেন, মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বেও আমাকে এবং মুরব্বী সাহেব ও সেক্রেটারী মাল সাহেবকে নিজ বাসায় ডাকেন যে, তার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করতে হবে, (যেন) এসে (তা) নিয়ে যাওয়া হয়। ভুল অভিযোগের ভিত্তিতে সেখানেও তাকে প্রশাসনের নিরাপত্তা বিভাগ থেকে তলব করা হয়, কিন্তু পরে ছেড়ে দেয়। [আচ্ছা, এটি পুরোনো কথা বলছেন; সিরিয়াতে ১৯৮৮ সালে তাকে (তলব করা হয়েছিল)।]

এরপর, তার সম্পর্কে কেউ একজন লিখেছেন, তাকে সিরিয়ার টিভি অনুষ্ঠানে কয়েকবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে তিনি ইসলামে মুরতাদের শাস্তি নিষিদ্ধের (বিষয়ে) বিশিষ্ট আলেমদের সাথে বিতর্ক করেছেন। এ কারণে তিনি প্রাণনাশের হুমকিও পান, যেগুলোর কতক অনলাইনে প্রকাশও করা হয়। তিনি একটি ফেসবুক পেজ-ও চালাতেন, যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলি থেকে নির্বাচিত অংশ শেয়ার করা হতো, যা আহমদী ও অআহমদী উভয়ই ফলো করত। তিনি তার সারা জীবন, নিজের শেষ নিঃশ্বাষ পর্যন্ত স্বীয় কলম এবং নিজ ভাষার ওপর অবিচল থেকে অতিবাহিত করেছেন। তার মৌলিক ও প্রধান চিন্তাভাবনা ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছানো এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার সত্য ধর্মের বিস্তার ঘটানো। যেখানেই সুযোগ লাভ হতো সেখানে বসে আলাপচারিতাকে আহমদীয়াত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা ও তাঁর বাণী প্রচারের দিকে মোড় ঘোরানোর সুযোগ হাতছাড়া হতে দিতেন না। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন, তার সন্তানদেরও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো আব্দুল বারি তারেক সাহেবের, যিনি ওয়াকফে জাদীদ রাবওয়ার কম্পিউটার বিভাগের ইনচার্জ ছিলেন; সম্প্রতি তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ওয়াকফে জাদীদের সদর সাহেব লিখেছেন, (তার পরিবারে) আহমদীয়াতের গোড়াপত্তন তার প্রপিতামহ শ্রদ্ধেয় চৌধুরী মুহাম্মদ ইয়ার সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল, যিনি শিয়ালকোট জেলার ঘাটিয়ালা নিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯০৩ সালে একটি পত্রযোগে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়াতে প্রবেশ করেন। মরহুমের দাদা চৌধুরী গোলাম কাদের সাহেব জন্মগত আহমদী ছিলেন। তিনি কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করার পর করাচিতে চাকুরি করতে থাকেন। তারপর তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভের পর পুনরায় ক্যান্সার ফিরে আসে। অতঃপর তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র সমীপে (দোয়ার) লিখলে তিনি তাকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ পাঠান এবং হোমিও চিকিৎসার পাশাপাশি অন্য চিকিৎসাও চালিয়ে যেতে বলেন। একই সাথে তিনি ওয়াকফের আবেদনও করেছিলেন, এতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তা গ্রহণ করেছিলেন আর তাকে তাহরীকে জাদীদ দপ্তরে প্রেরণ করেন; এরপর ওয়াকফে জাদীদ দপ্তরে তার পদায়ন হয়। সবগুলো দপ্তর কম্পিউটারাইজ করা ছাড়াও জামা'তের অন্যান্য দপ্তরেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। বরং পাকিস্তানের বাহিরে কানো আহমদীয়া হাসপাতাল, নাইজেরিয়া এবং বেনিনের আহমদীয়া হাসপাতালে কম্পিউটারাইজ করারও তিনি তৌফিক লাভ করেছেন। এমনকি কানোর ডাক্তার সাহেব তো লিখেছেন যে, আমরা কম্পিউটারাইজ করতে চাচ্ছিলাম যেখানে কয়েক লাখ টাকা খরচ হবার কথা ছিল এবং অনেক দরদাম করেও আমরা যে এস্টিমেট পেয়েছিলাম– তা-ও ছিল হাজার ডলারের। কিন্তু তিনি এসে এক মাস অবস্থান করে অনেক কম অর্থ ব্যয়ে আমাদের সব কাজ করে দেন।

মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার মা, স্ত্রী, এক পুত্র এবং পাঁচ ভাই রেখে গেছেন এবং বোনও রয়েছে। তিনি যখন ওয়াকফ করেন; [অসুস্থতার পর তিনি সুস্থ হয়েছিলেন; তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে, সুস্থ হয়ে ওয়াকফ করব;] সুস্থতাও লাভ করেন এবং তিনি একুশ বছর পর্যন্ত নিঃস্বার্থ কাজ করেছেন; দিন আর রাত দেখেন নি। আর ওয়াকেফীনদের জন্য এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

কেন্দ্রীয় আনসারুল্লাহ্ বিভাগে তিনি কায়েদ হিসেবে কাজ করছিলেন; সে প্রেক্ষিতেই কোথাও সফরে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তার হার্ট এটাক হয় এবং মৃত্যু বরণ করেন। আনসারুল্লাহ্‌র সদর ডাক্তার সুলতান সাহেব বলেন, তিনি ব্যবস্থাপনার এবং খিলাফতের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন আর তিনি তার ওয়াকফ পরিপূর্ণরূপে বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছেন। ধর্মের সেবায় সর্বদা ব্যস্ত থাকায় তিনি আনন্দিত হতেন আর দায়িত্ব পালন করে শান্তি অনুভব করতেন। কেউ তাকে বলে, আপনি যে মানুষের কাজ করে দেন, এর জন্য তাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিকও নিন। আপনি সফটওয়ার ইত্যাদি তৈরি করেন, এত পরিশ্রম করেন! এতে তিনি বলেন, আমি ওয়াকেফে যিন্দেগী আর আমার প্রতিদান খোদার কাছ থেকে লাভ হবে। যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, তিনি ওয়াকফের প্রেরণা নিষ্ঠার সাথে পূর্ণ করেছেন আর ওয়াকফের কল্যাণের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন; শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেবা করার অঙ্গীকার করেছিলেন আর তা তিনি পূর্ণও করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)